৭ম পর্ব, ১ম সংখ্যা
মার্চ ২০১৮

ইনফো

স্বাস্থ্য সাময়িকী

মার্চ

২০১৮

সূচী

রোগের ইতিকথা	২
মানবদেহ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
বিশেষ প্রবন্ধ	৬
জীবাণু পরিচিতি	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
চিকিৎসা পদ্ধতি	১২
স্বাস্থ্যকথা	১৪
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা
ডাঃ কে. এম. তৌফিকুল ইসলাম

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড-১২৩, বাড়ী-১৮এ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

যক্ষ্মা

ধারণা করা হয় যক্ষ্মা রোগের জীবাণুর আবির্ভাব হয়ে ছিল আজ থেকে ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে। মধ্যযুগে “স্ক্রোফোলা” নামক লসিকা গ্রন্থির একটি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে ছিল, যেটি পরবর্তীতে যক্ষ্মা রোগের একটি ভিন্ন ধরণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে এ রোগটি “কিংস এভিল” নামে পরিচিত ছিল এবং তখনকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যে অভিজাত সম্প্রদায়ের কারো স্পর্শেই এ রোগটি থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। ১৭২০ সালে ইংল্যান্ড এর একজন চিকিৎসক বেঞ্জামিন মারটিন যক্ষ্মা রোগ সনাক্ত করতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮৮২ সালের ২৪ শে মার্চ ডা. রবার্ট কোচ জার্মানির বার্লিনে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস *(Mycobacterium tuberculosis)* নামক ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন যার মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগটি হয়। ডা. রবার্ট কোচের এই ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার ছিল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ওই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিসিজি টিকা, টিউবারকুলিন টেস্ট, নানা প্রকার ওষুধ ও ডটস পদ্ধতির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে।

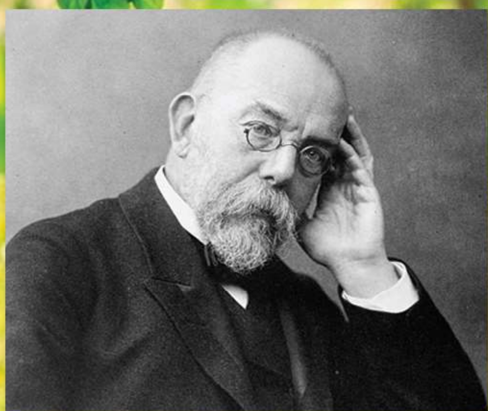

ডা. রবার্ট কোচ
(১৮৪৩-১৯১০)

কোষ, কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র

মানবদেহের বিভিন্ন রোগ ও তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে মানবদেহের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। প্রতিটি জীবদেহ এক ধরণের ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ে গঠিত, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম হলো কোষ। মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। কিছু কোষের সমন্বয়ে কলা, বিভিন্ন কলা দ্বারা গঠিত অঙ্গ এবং বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা তন্ত্র গঠিত হয়। এসব উপাদান সমন্বিতভাবে কাজ করে আমাদের দেহকে সর্বদা সচল, কর্মক্ষম ও নিরোগ রাখছে। আর এদের কোন একটি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারলে বিভিন্ন রোগ হয়।

মানুষ সাধারণত ৫ থেকে ৬ ফুট লম্বা হয়। মানুষের শরীরের উচ্চতা জীনগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও খাদ্য, গর্ভকালীন যত্ন, ব্যায়াম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন এবং তাদের কার্যাবলী যথাক্রমে অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীর বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায়।

এনাটমি (অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা)ঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন- হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক, হাড়, পেশী, রক্তনালী ও স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির স্বাভাবিক অবস্থান ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে এনাটমি বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বলে।

ফিজিওলজি (শারীর বিদ্যা)ঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ফিজিওলজি বা শারীর বিদ্যা বলে।

কোষ
↓
কলা
↓
অঙ্গ
↓
তন্ত্র

কোষ (Cell)

জীবদেহের একক হলো কোষ। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দেহে কোষের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ কোটি। এ সকল কোষ জীব বিজ্ঞানের আদর্শ অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে মানবদেহ গঠন করে। আমাদের শরীরে

সবচেয়ে ছোট কোষ হল শুক্রাণু (Sperm) যা ৫ থেকে ৭ মাইক্রন লম্বা (১ মিলিমিটার = ১০০০ মাইক্রন) এবং ৩ থেকে ৪ মাইক্রন প্রশস্ত। আর সবচেয়ে বড় কোষ হল ডিম্বাণু (Ovum) যার ব্যাস ৬০ মাইক্রন। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না।

কোষের গঠন

একটি কোষ মূলত তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো-

- কোষ পর্দা (Cell Membrane)
- নিউক্লিয়াস (Nucleus)
- সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু উপাদান থাকে। যেমন-

- মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)
- রাইবোজম (Ribosome)
- এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic Reticulum)
- গলজি এপারেটাস (Golgi Apparatus)
- লাইসোজম (Lysosome)

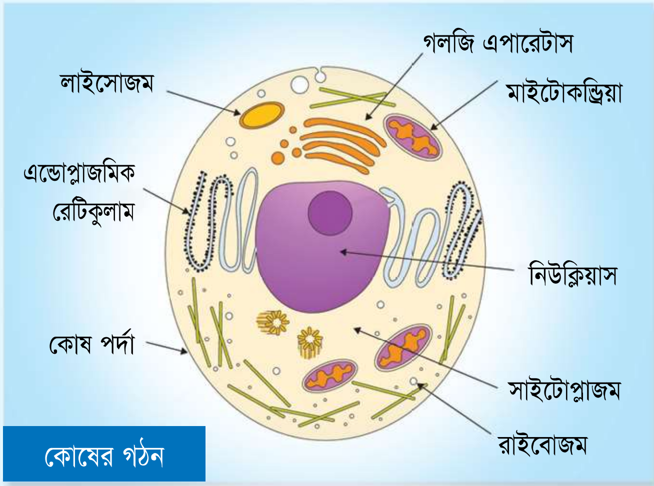

কোষের গঠন

কলা (Tissue)

কলা হচ্ছে কতগুলো কোষের সমষ্টি যাদের কিছু সাধারণ গঠনগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং যারা একই রকম কাজ করে। মানবদেহে চার ধরণের কলা পাওয়া যায়-

- আবরণী কলা (Epithelial Tissue) যেমন- ত্বক
- যোজক কলা (Connective Tissue) যেমন- রক্ত কণিকা
- পেশী কলা (Muscle Tissue) যেমন- মাংসপেশী
- স্নায়ু কলা (Nervous Tissue) যেমন- মস্তিষ্ক

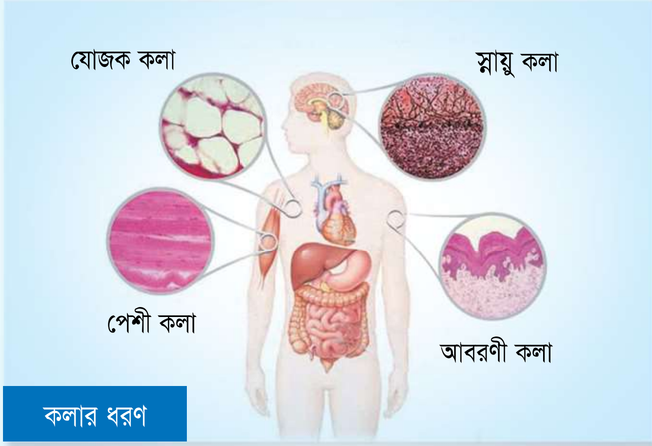

কলার ধরণ

অঙ্গ (Organ)

বিভিন্ন কলা সংঘবদ্ধ হয়ে যখন একই ধরণের কাজ করে তখন তাকে অঙ্গ বলে। যেমন- হাত, পা, চোখ, যকৃত, কিডনী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলি ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি।

তন্ত্র (System)

বিভিন্ন অঙ্গ একত্রিত হয়ে যখন জীবন রক্ষার্থে একই ধরণের কাজ করে তখন সেই অঙ্গ সমষ্টিকে একত্রে একটি তন্ত্র বলে। যেমন- দেহের শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য নাসিকা, শ্বাসনালী, ফুসফুস প্রভৃতি মিলিয়ে শ্বসনতন্ত্র গঠিত হয়। মানবদেহকে দশটি তন্ত্রে ভাগ করা হয়েছে-

- অস্থিতন্ত্র (Skeletal System)
- পেশীতন্ত্র (Muscular System)
- রক্ত সংবহনতন্ত্র (Cardiovascular System)
- শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)
- পরিপাকতন্ত্র (Digestive System)
- রেচনতন্ত্র (Urinary System)
- স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)
- প্রজননতন্ত্র (Reproductive System)
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine System)
- পঞ্চেন্দ্রিয় তন্ত্র (Special Sensory System)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

টিনিয়া বা দাদ

টিনিয়া বা দাদ

টিনিয়া একটি ছত্রাকজনিত সংক্রামক চর্মরোগ যা *Dermatophytes* নামক ছত্রাক দিয়ে হয়ে থাকে। সাধারণত টিনিয়া শরীরের ঘামে ভেজা অংশে হয়ে থাকে। এছাড়াও শরীরের কোন অংশ অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন থাকলে এই ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। শরীরের আক্রান্ত স্থানের উপর নির্ভর করে টিনিয়ার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- টিনিয়া ক্রুরিস (কুঁচকির দাদ), টিনিয়া ক্যাপিটিস (মাথার দাদ), টিনিয়া কর্পোরিস (শরীরে বা হাত পায়ে দাদ), টিনিয়া পেডিস (পায়ের পাতায় দাদ) ও টিনিয়া আঙ্গুইয়াম (নখে দাদ)।

ওরাল থ্রাস

ওরাল থ্রাস হলো মুখের ছত্রাকজনিত রোগ যা *Candida albicans* নামক ছত্রাক দিয়ে হয়ে থাকে। এটি ওরাল ক্যানডিডিয়াসিস নামেও পরিচিত। ওরাল থ্রাস সাধারণত জিহ্বা ও মুখের ভিতরের দিকে, দাঁতের মাড়ি, টনসিল ও গলায় হতে পারে। সাধারণত কোন কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে অথবা অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে মুখের নরমাল ফ্লোরার পরিমাণ হ্রাস পায়, যার ফলে এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

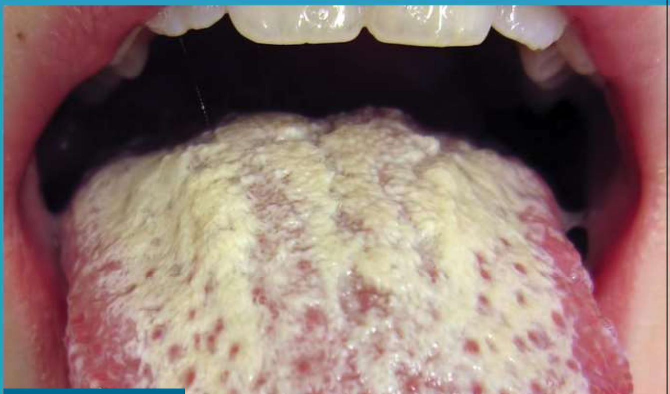
ওরাল থ্রাস

গাউট

গাউট

গাউট হচ্ছে অস্থিসন্ধির একটি প্রদাহজনিত রোগ। রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে গাউট হয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে অস্থিসন্ধিতে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়। গাউট সাধারণত শরীরের ছোট অস্থিসন্ধিতে হয়ে থাকে যেমন- পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের অস্থিসন্ধি। এছাড়া পায়ের গোড়ালি, হাটু, হাতের কনুই, কব্জি ও আঙ্গুলের অস্থিসন্ধিতেও এই রোগ হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

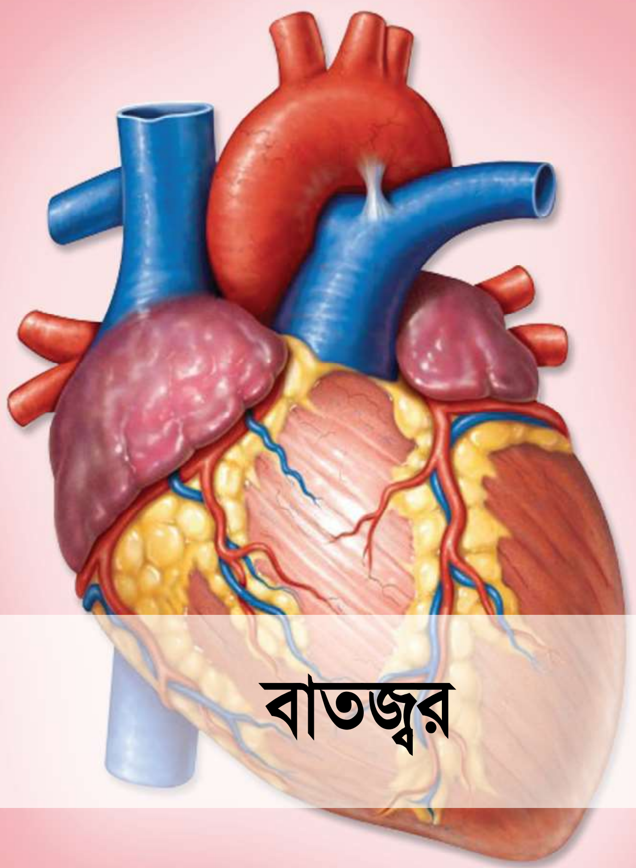

বাতজ্বর

বাতজ্বর বা রিউম্যাটিক ফিভার এক ধরণের প্রদাহজনিত রোগ। এ রোগ সাধারণত প্রথমে গলায় সংক্রমিত হয় এবং ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর এই রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এই রোগ হলে রোগীর নিজের শরীরের টিস্যুর বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যাদের শরীরে এই রোগের জিন রয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় খুব সহজে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগটি সাধারণত ৫ থেকে ১৫ বছরের শিশুদেরই বেশি হয়ে থাকে। তবে অল্পবয়স্ক শিশু এবং বড়দেরও বাতজ্বর হতে পারে। বাতজ্বরজনিত জটিলতা বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। সাধারণত শিশুরা বাতজ্বরে বেশী আক্রান্ত হয় এবং সময়মত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা চিকিৎসা না করলে এই জীবাণু অতি সহজেই হৃৎপিন্ডকে আক্রমণ করে। পরবর্তীকালে হৃৎপিন্ডের ভাল্ব নষ্ট হয়ে যায় ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই রোগ একবার হয়ে গেলে সব সময় ওষুধের মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কখনো রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না। ওষুধে কাজ না হলে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের ভাল্ব মেরামত করতে বা ভাল্ব বদলে ফেলতে হয়।

কারণ

বাতজ্বর একটি সংক্রামক রোগ। গ্রুপ-এ বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া (Group-A *beta heamolytic streptococcus*) দ্বারা স্কারলেট ফিভার (Scarlet Fever) বা ফ্যারিঞ্জাইটিস (Pharyngitis) জাতীয় ইনফেকশন হয় যার থেকে পরবর্তীতে বাতজ্বর বা রিউম্যাটিক ফিভার হয়ে থাকে। গলায় সংক্রমণের চিকিৎসা ঠিক মতো না হলে এই রোগ হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। অন্যান্য যেসব কারণে বাতজ্বর হবার ঝুঁকি থাকে সেগুলো হলো-

- পুষ্টিহীনতা
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ
- ঠান্ডা আবহাওয়া
- দরিদ্র আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ফ্যারিঞ্জাইটিস

লক্ষণ

বাতজ্বরের রোগীর সাধারণত নিচের লক্ষণসমূহ দেখা দেয়-

- জ্বর হতে পারে
- অস্থিসন্ধিতে মৃদু বা তীব্র ব্যথা হয় যা প্রায়ই পায়ের গোড়ালি, হাঁটু, কনুই অথবা হাতের কব্জি এবং কখনো কখনো কাঁধ, কোমর, হাত ও পায়ের পাতায় হতে পারে
- ব্যথা সাধারণত এক অস্থিসন্ধি থেকে আরেক অস্থিসন্ধিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে
- অস্থিসন্ধি লাল, উষ্ণ ও ফুলে যেতে পারে
- ত্বকের নিচে ক্ষুদ্র ব্যথাহীন দলা হতে পারে
- বুক ধড়ফড় করতে পারে
- বুকে ব্যথা হতে পারে
- অল্পতে ক্লান্ত বা দুর্বল লাগতে পারে
- শ্বাসকষ্ট হতে পারে
- শরীরের বিভিন্ন অংশে চ্যাপ্টা অথবা সামান্য ফোলা ব্যথাহীন লালচে দানা দেখা দিতে পারে

ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস

উপরের লক্ষণগুলো অন্যান্য যে সকল রোগের লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যায় তা নিচে দেয়া হলো-

- রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস (Rheumatoid Arthritis)
- অস্টিওমায়েলাইটিস (Osteomyelitis)
- একিউট গাউটি আরথ্রাইটিস (Acute Gouty Arthritis)
- সেপটিক আরথ্রাইটিস (Septic Arthritis)
- লাইম ডিজিজ (Lyme Disease)

রোগ নির্ণয়

চিকিৎসাবিজ্ঞানী T. Duckett Jones, ১৯৪৪ সালে বাতজ্বর নির্ণয়ের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন যা জোন'স ক্রাইটেরিয়া নামে পরিচিত। এই নীতিমালা অনুসারে বাতজ্বরের উপসর্গগুলোকে মেজর ক্রাইটেরিয়া ও মাইনর ক্রাইটেরিয়া দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-

- দুটি মেজর ক্রাইটেরিয়া এবং এর সাথে গ্রুপ-এ বিটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস দ্বারা সংক্রমণের প্রমাণ থাকতে হবে
- একটি মেজর ও দুটি মাইনর ক্রাইটেরিয়া মিলতে হবে এবং এর সাথে গ্রুপ-এ বিটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস দ্বারা সংক্রমণের প্রমাণ থাকতে হবে

মেজর ক্রাইটেরিয়া

- কারডাইটিস (Carditis)
- ইরায়থেমা মারজিনেটাম (Erythema Marginatum)
- মাইগ্রেটরি পলিআরথ্রাইটিস (Migratory Polyarthritis)
- সিডেনহাম কোরিয়া (Sydenhum Chorea)
- সাবকিউটেনিয়াস নডিউল (Subcutaneous Nodule)

কারডাইটিসঃ ৫০ থেকে ৬০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে এটি হয়। বাতজ্বরে হার্টের তিনটি স্তরেই (এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম ও পেরিকার্ডিয়াম) প্রদাহ হয় যা প্যানকার্ডাইটিস নামে পরিচিত। হার্টের ভাল্ব বা কপাটিকা বিশেষ করে মাইট্রাল ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাইট্রাল ভাল্ববের সাথে কখনো কখনো অ্যাওর্টিক ভাল্বও আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে হার্টের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

ইরায়থেমা মারজিনেটাম

ইরায়থেমা মারজিনেটামঃ ৫ ভাগ বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের ত্বকে এক ধরণের লালচে ফুসকুড়ি হয়, যার মধ্যভাগ বিবর্ণ থাকে এবং কোন ব্যথা অনুভূত হয় না। একে ইরাইথেমা মারজিনেটাম বলে। এটি দেহ, হাত ও পায়ে হয়ে থাকে তবে মুখমণ্ডলে হয় না।

মাইগ্রেটরি পলিআরথ্রাইটিসঃ বাতজ্বরে আক্রান্ত ৭৫ ভাগ রোগীর এই লক্ষণটি হয়ে থাকে। সাধারণত হাঁটু, গোড়ালির গাঁট, কব্জি ও কনুই এর মতো বড় জয়েন্টগুলো মাইগ্রেটরি পলিআরথ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত জয়েন্ট ফুলে লাল হয়ে যায় ও অত্যন্ত ব্যথা থাকে। তবে জয়েন্ট এর এই সমস্যা নিজে নিজেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। মেরুদণ্ড, হাত ও পায়ের ছোট ছোট জয়েন্ট ও নিতম্বের জয়েন্ট আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সিডেনহাম কোরিয়াঃ বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস পরে সিডেনহাম কোরিয়া হতে পারে। আক্রান্ত রোগীদের হাত বেঁকে গিয়ে চামুচের মতো আকৃতি ধারণ করতে পারে, জিহ্বা বাইরে বের হয়ে লাফাতে থাকে। রোগীর হাতের লেখা খারাপ হতে থাকে। রোগী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

সাবকিউটেনিয়াস নডিউলঃ ৫ থেকে ৭ ভাগ বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদের ত্বকের নিচে ব্যথাহীন কিছুটা শক্ত দলা পাওয়া যায়, একে সাবকিউটেনিয়াস নডিউল বলে।

সাবকিউটেনিয়াস নডিউল

মাইনর ক্রাইটেরিয়া

- জ্বর
- আর্থ্রালজিয়া বা জয়েন্টে ব্যথা
- রক্তে ইএসআর (ESR), সিআরপি (CRP) বেড়ে যায়
- ইসিজিতে (ECG) - PR interval দীর্ঘ হয়
- পূর্বে বাতজ্বর হওয়ার ইতিহাস থাকলে

পরীক্ষা

বাতজ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীকে নিচের পরীক্ষাগুলো করতে হবে-

- সিবিসি (CBC)
- ইএসআর (ESR)
- থ্রোট সোয়াব কালচার (Throat Swab Culture)
- এএসও টাইটার (ASO Titre)
- বুকের এক্সরে (Chest X-Ray)
- ইসিজি (ECG)
- ইকোকার্ডিওগ্রাফি (Echocardiography)

চিকিৎসা

জ্বর ও ব্যথা দমন করার জন্য প্যারাসিটামল বা এসপিরিন নির্দিষ্ট সময় পরপর দিতে হবে। যদি কেবল গলা ব্যথা থাকে তবে Phenoxymethyl Penicillin ১০ দিন দিতে হবে। যদি বাতজ্বর থাকে এবং হৃৎপিন্ডের কোনো উপসর্গ না থাকে তবে Phenoxymethyl Penicillin অথবা Benzathine Penicillin ২২ বছর বয়স পর্যন্ত অথবা শেষবার আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা দিতে হবে। যদি বাতজ্বরের ফলে হৃৎপিন্ডের প্রদাহ (Carditis) দেখা দেয় তবে Phenoxymethyl Penicillin অথবা Benzathine Penicillin ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত দিতে হবে। বাতজ্বরের ফলে যদি হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব আক্রান্ত হয় তবে সারাজীবন চিকিৎসা নিতে হবে। হার্টের ভাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে অপারেশন করে ভাল্ব পরিবর্তন করতে হবে। হার্টের প্রদাহ থাকলে আক্রান্ত রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলতে হবে।

জটিলতা

- পেরিকারডাইটিস (Pericarditis)
- পেরিকারডিয়াল ইফিউশন (Pericardial Effusion)
- হার্ট ফেইলিওর (Heart Failure)
- মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ (Mitral Valvular Disease)
- এওরটিক ভালভুলার ডিজিজ (Aortic Valvular Disease)

প্রতিরোধ

বাতজ্বর একটি মারাত্মক ব্যাধি। বাতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমাদের দেশে শত শত শিশু প্রতি বছর অকালে মৃত্যুবরণ করছে। যারা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকে তাদের অনেকেরই হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা কমে যায়। এজন্য সঠিক সময়ে এই রোগ নির্ণয় করতে হবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ১. Davidson's Principal and Practice of Medicine; 22nd Edition
২. ইন্টারনেট

স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস (*Staphylococcus aureus*)

বৈশিষ্ট্য

- স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস এক ধরণের গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া
- এর আকৃতি গোলাকার
- ইহা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান তৈরি করে যেমন- টক্সিন ও এনজাইম

যে সকল রোগ করে

স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস সাধারণত সরাসরি সংক্রমণ ও টক্সিন তৈরির মাধ্যমে মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে।

- চামড়া- ইমপেটিগো, সেলুলাইটিস ও বয়েল
- হাড় ও জোড়া- অসটিওমায়েলাইটিস
- মস্তিষ্ক- মেনিনজাইটিস, ব্রেইন এবসেস
- হৃৎপিন্ড- ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস
- ফুসফুস- নিউমোনিয়া
- রক্ত- সেপটিসেমিয়া, টক্সিক শক সিন্ড্রোম
- পরিপাক তন্ত্র- ফুড পয়জনিং

চিকিৎসা

উল্লিখিত রোগের কারণে যে সকল এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- ফ্লুক্লক্সাসিলিন (Flucloxacillin)
- লিনেযলিড (Linezolid)
- সিপ্রোফ্লক্সাসিন (Ciprofloxacin)
- ক্লিন্ডামাইসিন (Clindamycin)
- এমক্সিসিলিন (Amoxicillin)
- ইমিপেনেম (Imipenem)
- মেরোপেনেম (Meropenem)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

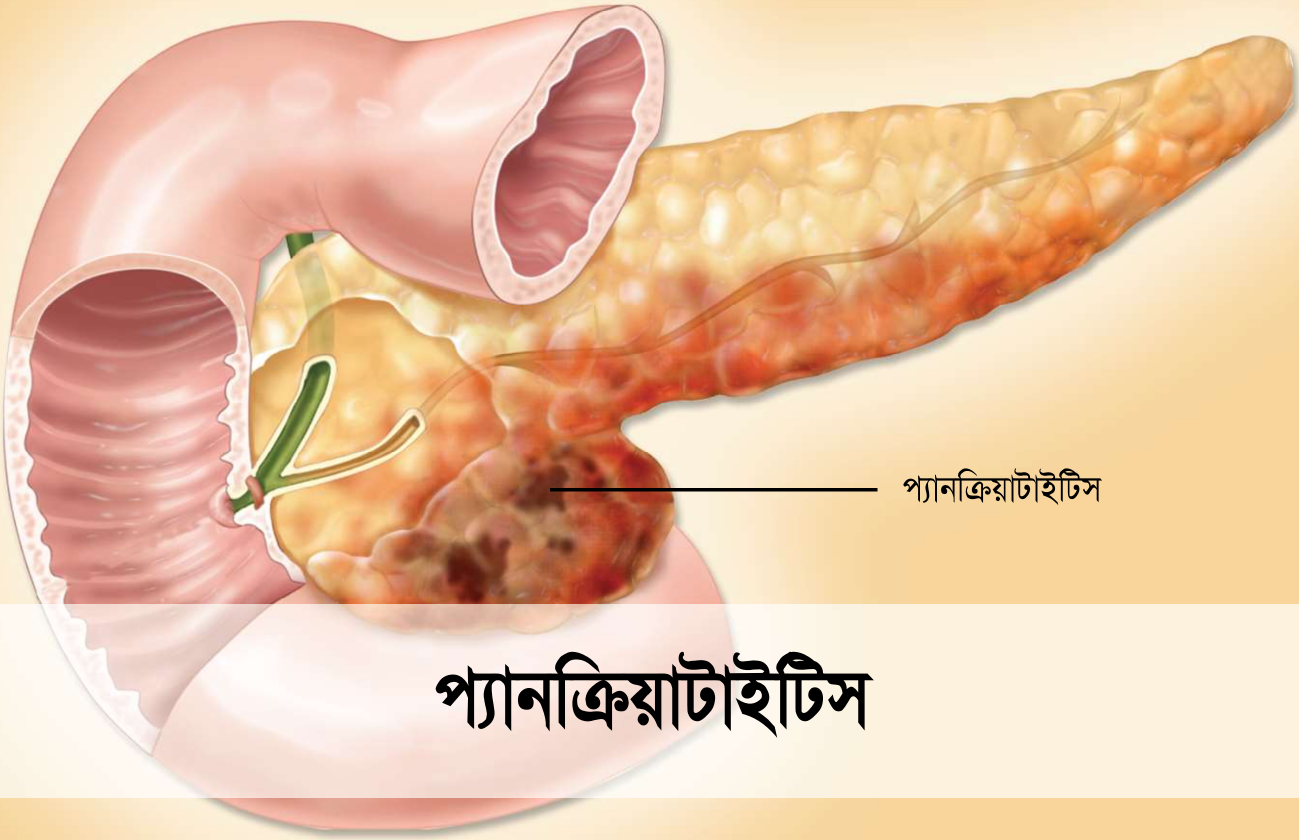

প্যানক্রিয়াটাইটিস

অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহকে প্যানক্রিয়াটাইটিস (Pancreatitis) বলে। অগ্ন্যাশয় (Pancreas) পেটের বামদিকে পাকস্থলির পিছনে অবস্থিত। অগ্ন্যাশয় শরীরে বিশেষ ধরণের এনজাইম ও হরমোন উৎপন্ন করে। এই এনজাইম খাদ্য হজমে সাহায্য করে এবং হরমোন শরীরে শর্করা বিপাকে সাহায্য করে থাকে। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহজনিত কারণে অগ্নাশয়ের কোষগুলো এর নিজস্ব এনজাইম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণত প্যানক্রিয়াটাইটিস অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ছাড়াই দূরীভূত হয়। তবে এই রোগ তীব্র আকার ধারণ করলে নানা ধরণের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রকারভেদ

প্যানক্রিয়াটাইটিস সাধারণত দুই ধরণের হতে পারে। যেমন-

- **একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসঃ** অগ্ন্যাশয়ের তীব্র ও ক্ষণস্থায়ী প্রদাহকে একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস বলে।
- **ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসঃ** অগ্ন্যাশয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহকে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস বলে।

কারণ

প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগটি হঠাৎ করেই হয়। সাধারণত যেসব কারণে প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে থাকে সেগুলো নিচে দেয়া হলো-

- পিত্তথলিতে পাথর হলে
- ধূমপান করলে
- হাইপারক্যালসেমিয়া হলে
- সিসটিক ফাইব্রোসিস হলে
- পেটে অস্ত্রোপচার করলে
- অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে
- ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে
- বংশে প্যানক্রিয়াটাইটিসের ইতিহাস থাকলে

লক্ষণ

নিচে প্যানক্রিয়াটাইটিসের লক্ষণগুলো দেয়া হলো-

- পেটে উপরের দিকে তীব্র ব্যথা হতে পারে
- বমি ও বমি বমি ভাব হতে পারে
- পিঠে ব্যথা হতে পারে
- জ্বর হতে পারে
- ক্ষুধামন্দা হতে পারে

পেট ব্যথা

ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস

উপরের লক্ষণগুলো অন্যান্য যে সকল রোগের লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যায় তা নিচে দেয়া হলো-

- একিউট কলিসিস্টাইটিস (Acute Cholecystitis)
- পারফোরেশন (Perforation)
- মায়োকারডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction)
- একিউট এপেন্ডিসাইটিস (Acute Appendicitis)

পরীক্ষা

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্যানক্রিয়াটাইটিস সনাক্ত করা যায়। পরীক্ষাগুলো নিচে দেয়া হলো-

- সেরাম এমাইলেজ- এর পরিমাণ বাড়বে
- সেরাম লাইপেজ- এর পরিমাণ বাড়বে
- ইউরিনারি এমাইলেজ- এর পরিমাণ বাড়বে
- আল্ট্রাসনোগ্রাম- অগ্নাশয়ের প্রদাহের লক্ষণ পাওয়া যাবে
- সিটিস্ক্যান- অগ্নাশয়ের প্রদাহের লক্ষণ পাওয়া যাবে

চিকিৎসা

প্যানক্রিয়াটাইটিস একটি জরুরী অবস্থা। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে। প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে নিচের ব্যবস্থা নিতে হয়-

- রোগীর অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয়ে যায় বা শকে চলে যায় তখন নিচের ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে-
  - নিয়মিত পালস্, ব্লাড প্রেসার ও শ্বাস প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে
  - শ্বাসের সমস্যার জন্য অক্সিজেন মাস্ক দিয়ে অক্সিজেন দিতে হবে
  - মুখ দিয়ে কোন কিছু খেতে দেয়া যাবে না
  - শিরাপথে স্যালাইন, প্লাজমা এমনকি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রক্ত দিতে হবে
  - গলায় কিছু জমে থাকলে নাকে নল দিয়ে সাকশন দিতে হবে
  - প্রস্রাবের রাস্তায় নল দিতে হবে
  - নিয়মিত কি পরিমাণ পানি শরীরে দেওয়া হচ্ছে এবং কতটুকু পানি শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে
- ব্যথা কমানোর জন্য পেথিডিন ইনজেকশন দিতে হবে
- অগ্ন্যাশয় এর সিক্রেশন কমানোর জন্য এট্রোপিন ইনজেকশন দিতে হবে
- প্রদাহ যাতে না হয় সেজন্য এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে
- পেটে পানি জমলে পেরিটোনিয়াল অথবা হেমোডায়ালাইসিস করতে হবে

জটিলতা

প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে নিচের জটিলতাসমূহ দেখা দেয়-

- হাইপোক্সিয়া (Hypoxia)
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া (Hypoglycemia)
- হাইপোক্যালসেমিয়া (Hypocalcaemia)
- প্যানক্রিয়েটিক সিউডোসিষ্ট (Pancreatic Pseudocyst)
- প্যানক্রিয়েটিক এবসেস (Pancreatic Abscess)
- ভেরিসিয়াল হেমোরেজ (Variceal Hemorrhage)
- ডিউডেনাল অবস্ট্রাকশন (Duodenal Obstruction)

তথ্যসূত্রঃ ১. Davidson's Principal and Practice of Medicine; 22nd Edition
২. ইন্টারনেট

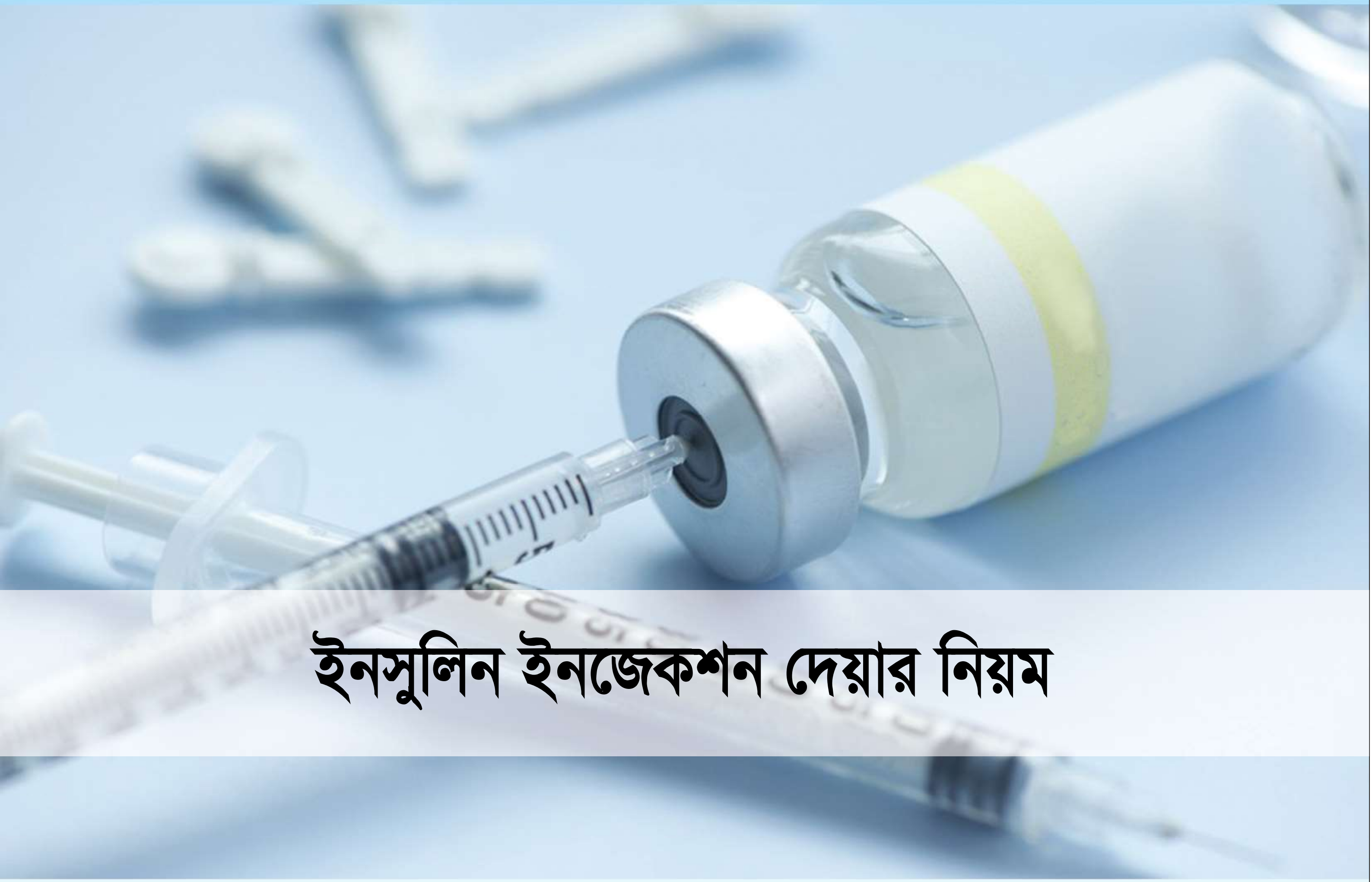

ইনসুলিন ইনজেকশন দেয়ার নিয়ম

সাধারণত টাইপ-১ ডায়াবেটিস এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশন ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবহার না জানার জন্য নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই এর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সকলের অবগতি থাকা প্রয়োজন। নিচে এই ইনজেকশনের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১) প্রথমে দেখে নিতে হবে ইনসুলিনের বোতলের ক্যাপ ঠিক আছে কিনা এবং বোতলের গায়ে এর কার্যক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার যে তারিখ লেখা আছে, তা অতিক্রম করেছে কিনা। লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতি মিলিলিটারে কত ইউনিট ইনসুলিন আছে, ৪০ ইউনিট না ১০০ ইউনিট। সেই হিসাবে ইনসুলিন সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে

২) ইনজেকশন নেবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (সিরিঞ্জ, তুলা ইত্যাদি) হাতের কাছে রাখতে হবে

৩) সাবান ও পরিস্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে

৪) দুই হাতের তালুর মধ্যে ইনসুলিনের বোতল ধরে ভালোভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে। তবে জোরে ঝাঁকুনি দেয়া উচিত না

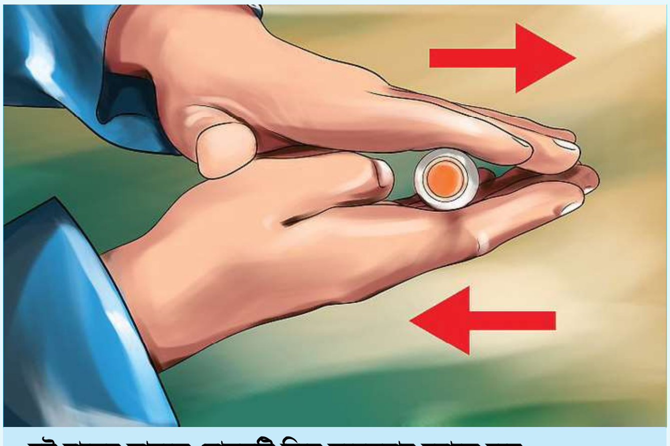

দুই হাতের তালুতে বোতলটি নিয়ে কয়েকবার ঘুরাতে হবে

৫) বোতলের রাবার ক্যাপ স্পিরিট দিয়ে মুছে নিতে হবে এবং বাতাসে তা আপনা আপনি শুকিয়ে নিতে হবে

৬) যতটুকু ইনসুলিনের দরকার সেই পরিমাণ বাতাস সিরিঞ্জের মধ্যে টেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে ৪০ ইউনিট ইনসুলিনের জন্য ৪০ ইউনিট সিরিঞ্জ এবং ১০০ ইউনিট ইনসুলিনের জন্য ১০০ ইউনিট সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে

৭) এবার সূঁচ বোতলের মুখের রাবারের মাঝখান দিয়ে ভিতরে ঢোকাতে হবে। হাত যাতে সূঁচের কোন অংশে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

৮) সিরিঞ্জের বাতাস বোতলে ঢোকাতে হবে

৯) এখন সূঁচসহ বোতলটি উল্টিয়ে ধরতে হবে। দেখা যাবে যে এমনিতেই সিরিঞ্জে পরিমাণ মতো ইনসুলিন এসে গেছে। প্রয়োজন হলে হালকা টান দিয়ে বাকি ইনসুলিন সিরিঞ্জে টেনে নিতে হবে

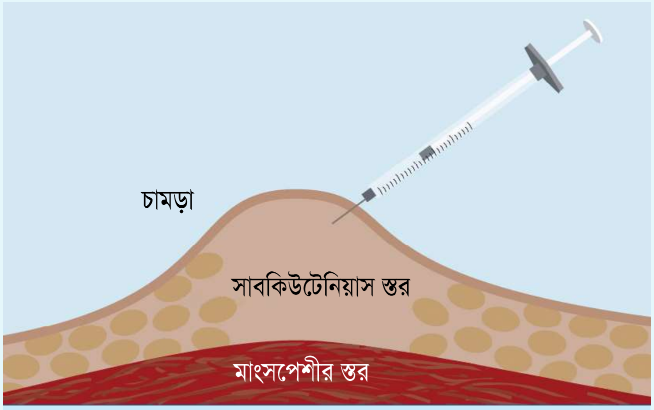

চামড়া টেনে ধরে ৪৫° থেকে ৭৫° কোণাকুণিভাবে সূঁচ ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং ইনসুলিন চামড়া এবং মাংসপেশীর মাঝের ফাঁকা স্থানে দিতে হবে

১৫) ইনসুলিন ইনজেকশন দেবার স্থানগুলো হলো দুই বাহুর বাইরের দিক, উরুর বাইরের দিক, দুই নিতম্বে এবং তল পেটের নিচের অংশের দুই দিক

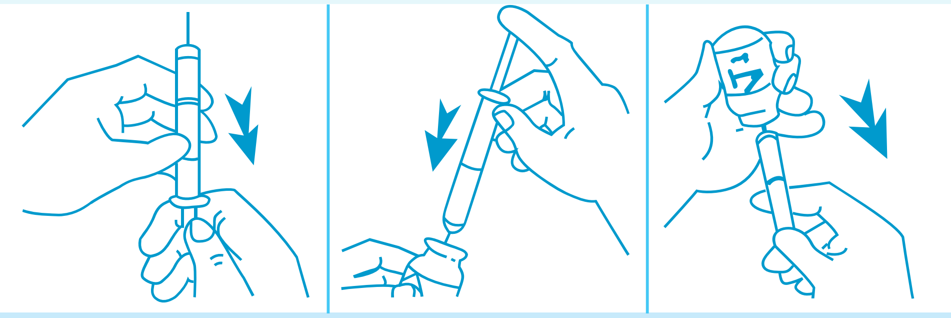

যে পরিমাণ ইনসুলিন নিতে হবে, সেই পরিমাণ বাতাস সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে তা বোতলটিকে উল্টে করে ধরে ঢুকাতে হবে। এতে পরিমিত ইনসুলিন আপনা আপনি সিরিঞ্জে চলে আসবে

১৬) প্রতিদিন একই স্থানে ইনজেকশন দেয়া উচিত নয়। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যেন এক মাসের মধ্যে একই স্থানে দুইবার ইনজেকশন না পড়ে

১০) সিরিঞ্জে যেন বাতাস বা বুদবুদ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাতাস বা বুদবুদ থাকলে তা বোতলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ইনসুলিন টানতে হবে

১১) এবার ইনসুলিনসহ সিরিঞ্জ টেনে বের করতে হবে এবং রোগীকে ইনজেকশন দিতে হবে

১২) যে স্থানে ইনসুলিন দিতে হবে, সেই স্থানটি স্পিরিট মাখা তুলো দিয়ে ভালোভাবে পরিস্কার করতে হবে এবং স্থানটি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে

১৩) ইনজেকশন দেয়ার স্থানটির চামড়া টেনে ধরে ৪৫° থেকে ৭৫° কোণাকুণিভাবে সূঁচ ঢুকিয়ে দিতে হবে

১৪) খেয়াল রাখতে হবে ইনসুলিন যেন চামড়া এবং মাংসপেশীর মাঝের ফাঁকা স্থানে (চামড়া বা মাংসপেশীর মধ্যে নয়) পৌঁছায়

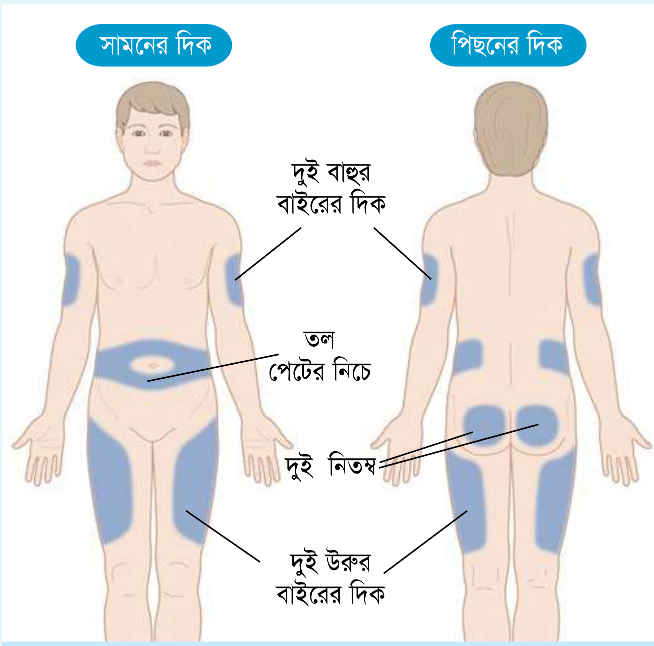

ইনসুলিন ইনজেকশন দেয়ার স্থানসমূহ

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গরম পানি পানের ৭ টি উপকারিতা

ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

গরম পানি ত্বক বা স্কিন সেলের ক্ষত সারিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে ত্বক টান টান হয়ে ওঠে এবং বলিরেখাও হ্রাস পায়। ফলে বয়সের কোনো ছাপই ত্বকের উপর পরতে পারে না।

১

ওজন হ্রাস করে

গরম পানি পান করলে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। ফলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার সুযোগই থাকে না। এছাড়া গরম পানি অ্যাডিপোস টিস্যু বা ফ্যাট ভেঙে ফেলে যার ফলে শরীরের ওজন হ্রাস পায়।

২

কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রকোপ কমায়

গরম পানি পানের অভ্যাস করলে ইনটেস্টাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে ইনটেস্টাইনে জমে থাকা ময়লা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রকোপ কমে যায়।

৩

হজম ক্ষমতার উন্নতি করে

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে খাবার খাওয়ার পর হালকা গরম পানি খেলে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। ফলে বদ হজম এবং গ্যাস এর মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৪

ব্রণের প্রকোপ কমায়

শরীরের ময়লা যত কম জমবে, ব্রণের পরিমাণ তত বাড়বে। আর যেহেতু গরম পানি টক্সিনের বিরোধী, তাই ব্রণের প্রকোপ কমাতে গরম পানি পান করলে অল্প দিনেই ব্রণ একেবারে সেরে যায়।

৫

ঠান্ডা লাগা এবং গলা ব্যথার প্রকোপ কমায়

এই ধরণের শারীরিক সমস্যায় গরম পানির কোনো বিকল্প নেই। গরম পানি রেসপিরেটারি ট্রাক্ট বা শ্বাসনালীকে পরিষ্কার করে ঠান্ডা লাগা এবং গলার অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে, সেই সঙ্গে বন্ধ নাক পুনরায় সচল করে।

৬

স্ট্রেস কমায়

গরম পানি পানের পর পরই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রেনের কার্যক্ষমটা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যার ফলে স্ট্রেস লেভেল কমতে থাকে।

৭

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ 'বাতজ্বর' থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো স্বাস্থ্য সাময়িকীর সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ৩০ মে ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১ বাতজ্বরের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম কি?

ক ☐ *Helicobacter pylori*
খ ☐ Group-A *beta heamolytic streptococcus*
গ ☐ *Mycobaterium tuberculosis*
ঘ ☐ *Mycobacterium leprae*

২ বাতজ্বরের ক্ষেত্রে নিচের কোন লক্ষণটি দেখা যায়?

ক ☐ অস্থিসন্ধিতে মৃদু অথবা তীব্র ব্যথা হওয়া
খ ☐ খাবারের রুচি বেড়ে যাওয়া
গ ☐ ওজন কমে যাওয়া
ঘ ☐ গ্রন্থি ফুলে যাওয়া

৩ নিচের কোনটি বাতজ্বরের মেজর ক্রাইটেরিয়া নয়?

ক ☐ কারডাইটিস
খ ☐ ইরাইথেমা মারজিনেটাম
গ ☐ আরথ্রালজিয়া
ঘ ☐ সাবকিউটেনিয়াস নডিউল

৪ বাতজ্বরে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কাদের বেশী?

ক ☐ শিশুদের
খ ☐ পুরুষদের
গ ☐ মহিলাদের
ঘ ☐ বৃদ্ধদের

৫ কোন বিজ্ঞানী জোনস ক্রাইটেরিয়া প্রবর্তন করেন?

ক ☐ T. Duckett Jones
খ ☐ Stephen Jones
গ ☐ Edward Janer
ঘ ☐ Jacob Jones

৬ বাতজ্বরের মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয় কোনটি?

ক ☐ ইরাইথেমা মারজিনেটাম
খ ☐ মাইগ্রেটরি পলিআরথ্রাইটিস
গ ☐ সাবকিউটেনিয়াস নডিউল
ঘ ☐ সিডেনহাম কোরিয়া

৭ বাতজ্বর নির্ণয় করার জন্য কোন পরীক্ষাটি করা হয় না?

ক ☐ সিবিসি
খ ☐ থ্রোট সোয়াব কালচার
গ ☐ এএসও টাইটার
ঘ ☐ ইউরিন টেস্ট

৮ কোনটি বাতজ্বরজনিত জটিলতা নয়?

ক ☐ পেরিকারডাইটিস
খ ☐ পেরিকারডিয়াল ইফিউশন
গ ☐ টিউবারকিউলোসিস
ঘ ☐ মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ

৯ নিচের কোন এন্টিবায়োটিকটি বাতজ্বরের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়?

ক ☐ Phenoxymethyl Penicillin
খ ☐ Azithromycin
গ ☐ Steroid
ঘ ☐ Rifampicin

১০ বাতজ্বরের আক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ হলে কত বছর পর্যন্ত চিকিৎসা দিতে হবে?

ক ☐ ৩০ বছর
খ ☐ ২২ বছর
গ ☐ ১০ বছর
ঘ ☐ ১৫ বছর

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এসিআই লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২